একটি বিষণ্ণ ব্রতকথার পাঠদুঃখ

গোপা দত্তভৌমিক

কিন্তু সবাই বলল সেদিন, হা কাপুষ হৃদ্দ কাঙাল
চোরের মতো ছাড়লি নিজের জন্মভূমি।
জন্মভূমি? কোথায় আমার জন্মভূমি খুঁজতে খুঁজতে জীবন গেল।
দিন কেটেছে চোরের মতো দিনভিখারির ঘোরের মতো
পথবিপথে, জন্মভূমির পায়ের কাছে ভোরের মতো।
জাগতে গিয়ে স্পষ্ট হলো
সবার পথে সবার সঙ্গে চলার পথে
আমরা শুধু উপলবাধা।
আমরা বাধা? জীবন জুড়ে এই করেছি?
দেশটাকে যে নষ্ট করে দিলাম ভেবে কষ্ট হলো।
(মন্ত্রীমশাই / শঙ্খ ঘোষ)

মিহির সেনগুপ্তের ‘বিষাদবৃক্ষ’ পড়ে মনে হচ্ছিল কতো যুগ পর বহু আকাঙ্খিত একটি বই হাতে এল। দেশভাগ এবং বাংলাদেশে সংখ্যালঘুর অস্তিত্ব সংকটের মতো স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে এমন ধরনের গ্রন্থ আগে পড়িনি। বঙ্গভূমির হাজার বছরের ইতিহাস পরিক্রমায় স্পষ্ট হয় বৌদ্ধ হিন্দু সংঘাত, কৌলিন্য প্রথার উৎকট অত্যাচার থেকে শু করে পাঠান, মোগল, মগ, হার্মাদ, বর্গীর উপদ্রবে জনজীবনে শান্তি ও সমৃদ্ধি যে নিরবচ্ছিন্ন ছিল তা মোটেই নয়। বহু দাঙ্গাহাঙ্গামা, সড়কি লাঠি, পলাশীর কামানগর্জন, কান্না আর রক্ত ইতিহাসের স্তরে স্তরে স্বভাবতই পুঞ্জিত হয়ে আসছে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা ভয়াল ঘটনাটি নিঃসন্দেহে ঘটেছিল ১৯৪৭ সালের অগাস্ট মাসে যখন দাঙ্গাবিধবস্ত উপমহাদেশে ভাগাভাগি ভাঙাভাঙির হরির লুটের পর দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র জন্মগ্রহণ করল। বাঙালির জীবনে এরথেকে বড়ো ট্রাজেডি আগে কখনো ঘটেনি পরেও ঘটবে কিনা জানিনা। মধ্যরাতের সেই বিখ্যাত স্বাধীনতা লাভে যখন গোটা দেশ আবেগবিহ্বল তখন দেশের পশ্চিম ও পূর্বপ্রান্তে পাঞ্জাব ও বাংলায় অন্য ইতিহাস রচিত হচ্ছিল যার প্রতিটি অধ্যায় ১৯৪৭ সালের আগস্টমাসে যখন দাঙ্গাবিধবস্ত উপমহাদেশে ভাগাভাগি ভাঙাভাঙির হরির লুটের পর দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র জন্মগ্রহণ করল। বাঙালির জীবনে এর থেকে বড়ো ট্রাজেডি আগে কখনো ঘটেনি পরেও ঘটবে কিনা জানিনা। মধ্যরাতের সেই বিখ্যাত স্বাধীনতা লাভে যখন গোটা দেশ আবেগবিহ্বল তখন দেশের পশ্চিম ও পূর্বপ্রান্তে পাঞ্জাব ও বাংলায় অন্য ইতিহাস রচিত হচ্ছিল যার প্রতিটি অধ্যায় সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, ভ্রাতৃবিরোধ, লজ্জা আর অপমানে কলঙ্কিত। স্বাধীনতা লাভ ও দেশ হারানো যুগপৎ দুটিই কোনো জাতির ভাগ্যে ঘটে যাওয়া সত্যিই একঅদ্ভুত স্ববিরোধী ব্যাপার। তখনো পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা অবশ্য সম্যক উপলব্ধি করেননি ভবিষ্যতে কী ঘটতে চলেছে। পশ্চিম ভারতের জনবিনিময়ের ফলে উদ্ভুত উত্তাল পরিস্থিতির পাশাপাশি হয় তো পূর্বভারত তুলনামূলক ভাবে তদ্দণ্ডে কিছুটা স্থির ছিল কিন্তু তা শুধু পরবর্তীকালে পূর্বপাকিস্তানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ক্রমিক উৎস

াদনের জন্য। নিজস্ব ভূমি থেকে উৎখাত করার পর পর্বে পর্বে ছিন্নমূল মানুষের নিরন্ন ঢল নেমেছে শেয়ালদা স্টেশনে, মানা ক্যাম্পে, দণ্ডকারণ্যে। ২০০৪ সালের ভয়ংকর সুনামিতে বিধবস্ত আন্দামান নিকোবরের সংবাদগুলি আমার মনে জাগিয়ে তুলছিল নোয়াখালির নিবারণ দাস আর ফরিদপুরের বিনোদ সরকারের মুখচ্ছবি। আন্দামানের সমুদ্রতীরে ডাব বিক্রি করতে করতে নিবারণ শুনিয়েছিল এক কাপড়ে গৃহত্যাগ করে ভারতে পালিয়ে আসার কণ কাহিনী। আন্দামানের নির্জন দ্বীপে পুনর্বাসন পেয়ে সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবেশে জঙ্গল হাসিল করে কঠিন মাটিতে ফসল ফলানোর ইতিহাসে বীরত্বের সঙ্গেবিষাদও কম নেই। এবার সুনামি তাদের মাথার ওপরের ছাদটুকু কেড়ে নিয়েছে, আবার হয়তো স্রোতের শ্যাওলার মতো তারা ভেসে বেড়াচ্ছে ক্যাম্পে, ক্যাম্পে। মিহির সেনগুপ্তের 'বিষাদবৃক্ষ' পড়তে পড়তে বাংলাদেশে কোনো ভরা ধ ানখেতের শিয়রে, কোনো ধারাবতী নদীর কূলে চিতার মতো পড়ে থাকা নিবারণ, বিনোদদের ভিটেগুলির রিক্তমূর্তি যেন দেখতে পাচ্ছিলাম। আরেক বরিশাল সন্তান মণীন্দ্র গুপ্তের আক্ষেপ মনে পড়ছিল, 'যে লোকটির কাছে, দেশহারা হওয়া এবং স্বাধীনতা প্রাপ্তি, একই দিনের ঘটনা, একমাত্র সে-ই জানে সোনার পাথর বাটি বা আঁটকুড়ীর ছেলের অন্নপ্রাশন কি জিনিস। বাকি ভারতের সঙ্গে গলা মিলিয়ে আমাদের বিষাদে হরিষ আর কতভাবেজানাব।'দেশভাগের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতির চাপ দ্বিখণ্ডিত বাংলাতে আজও পুরোপুরি রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই ভয়াবহ ধাক্কায় বাঙালির আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভারসাম্য নানা দিক দিয়ে বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছে। জানিনা কবে, কোনকালে অথবা আদৌ আমরা এই রাহুগ্র াস থেকে মুক্ত হতে পারবো কি না। পুব বাংলা থেকে নানা ছলছুতোয় উন্মূলিত মানুষের স্রোত এখনো পশ্চিমবঙ্গের ভঙ্গুর তটে বারবার আশ্রয়ের প্রত্যাশায় আছড়ে পড়ছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাতে যুক্ত হয়েছে নানা জটিল মাত্রা। র াষ্ট্রবিপ্লব বা দুর্ভিক্ষ, সামন্ততন্ত্রের অথবা সামরিক শাসনের চাপ যুগে যুগেই হয়তো মানুষকে উচ্ছিন্ন করেছে কিন্তু বঙ্গ ভূমিতে এমন ব্যাপক হারে পূর্বে তা কখনো হয়নি।কবি মুকুন্দরাম ছয়সাত পুষের নিবাস দামিন্যা ছেড়ে ডিহিদার মামুদ শরীফের অত্যাচারে মেদিনীপুরে পালিয়েছিলেন। মধ্যযুগে এমনঘটনার অভাব ছিল না। বর্গীর হাঙ্গামার কালে পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে বহুমানুষ পাড়ি দিয়েছিলেন ক্ষুব্ধ অন্নদাশংকর রায় তাঁর ব্যঙ্গকণ' লক্ষ্মণ সেনের প্রত্যাবর্তন' ছড়ায়। ইতিহাসে নিন্দিত কাপুষ রাজার সঙ্গে এক সারিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে লক্ষ লক্ষ বাঙালি, খিড়কিদুয়োরদিয়ে প্রাণ নিয়ে পালানোর ঐতিহ্য অব্যাহত রাখতে বাধ্য হয়েছে তারা। শুধু আজ গতি বিপরীত দিকে, গৌড় থেকে বঙ্গ নয়, বঙ্গ থেকেগৌড় ---

লক্ষ লক্ষ সেন যেন
লক্ষ লক্ষ চৌর।

বাঙালির ইতিহাসের এতো বড়ো বিপর্যয় স্বভাবতই এপারে এবং ওপারে দুই বাংলাতেই সাহিত্যে নানা ভাবে প্রভাব ফেলেছে। দেশভাগ নিয়ে গল্প উপন্যাস, স্মৃতিকথা আমরা পেয়েছি কিছু, কিন্তু কখনোই তা আমাদের যথেষ্ট বলে মনে হয়নি। কখনো কখনো মনে হয়েছে এটি এমনি এক কলঙ্ক, এমন বেদনাদায়ক ক্ষত যে আত্মগর্বিত বাঙালি যেন তা নিয়ে খুব বেশি নাড়াচাড়া করতে চাননা, বহিপৃথিবীর দৃষ্টি থেকে সন্তর্পণে লুকিয়ে রাখতে চায় আত্মঘাতী সংঘর্ষের লাঞ্ছনা আর অপমান মাখা চিহ্নসমূহ। এই দ্বিধাজড়িত মানসিকতার প্রেক্ষাপটে মিহির সেনগুপ্তের 'বিষাদবৃক্ষ' কে একটি অমূল্য উন্মে াচন বলে মনে হয়েছে। কঠিন সত্যকে স্বীকার করতে তিনি দ্বিধাবোধ করেননি। ঠিক 'মিড্‌নাইট চিলড্রেনের' কোঠায় না পড়লেও, মিহির সেনগুপ্ত জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯৪৭ সালেই সেপ্টেম্বর মাসে। তাঁর শৈশব ও কৈশোর কেটেছে তৎক ালীন পূর্বপাকিস্তানে, ১৯৬৩ সালে তিনি কলকাতায় চলে আসেন। 'বিষাদবৃক্ষে' ধরা রয়েছে স্বাধীনতা পরবর্তী পূর্ব পা কিস্তানের বিপর্যস্ত পটভূমিতে তাঁর বড়ো হয়ে ওঠার অভিজ্ঞতা, আর ঠিক এইখানেই বইটির অনন্যতা। দেশভাগের ওপর লেখা গল্প উপন্যাস স্মৃতিকথায় আমরা প্রধানত পেয়েছি উদ্বাস্তু জীবনের নিষ্ঠুর চালচিত্র। দেশ ছেড়ে চলে আসার পর পশ্চিমবঙ্গের স্টেশন, ক্যাম্প ফুটাত, অনিচ্ছুক আত্মীয় বাড়ি বা কলোনিতে কলোনিতে মানুষের টিকে থাকার লড়াই, পুরনো মূল্যবোধ খোয়ানো আবার নতুন কোনো সামাজিক সংজ্ঞায় পৌঁছোনোর আখ্যান। ঋত্বিক যে সংগ্রামের মহাকা ব্যিক রূপ দিয়েছেন তাঁর ঐতিহাসিক মেঘে ঢাকা তারা' চলচিচত্রে। অবশ্যই আমি অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসাধারণ উপন্যাস 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে'র দুটি খণ্ডকে ভুলে যাচ্ছিনা। বস্তুত 'বিষাদবৃক্ষ' পড়তে গিয়ে মাঝে মাঝে ঐ উপন্য াসটির কথা মনে পড়ে। পূর্ববঙ্গের একদা সম্পন্ন ভূস্বামী পরিবারের ক্ষয়িষ্ণু জীবন ছবি দুটি গ্রন্থেই ফুটে উঠেছে। হিন্দু স ম্প্রদায়ের বদ্ধমূল আচার সংস্কার, সংকীর্ণ ধর্মবোধ আবার এ সব ছাপিয়ে দুই সম্প্রদায়ের এক ধরনের আত্মীয়তা বিশেষ

করে নিম্নবর্গের জীবনাচরণে কীভাবে গড়ে উঠেছিল তা অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ও লক্ষ করেছেন। উপন্যাসে জববর, করিমরা বিধবা মালতীকে ধর্ষণ করে কবরভূমিতে শেয়াল কুকুরের খাদ্য হিসেবে ফেলে রেখে যাবার পর তাকে পিতামাতার মতো স্নেহে, সেবায় বাঁচিয়ে তুলেছে ফকিরসাব আর পীরানি জোটন। ভৌমিক পরিবারের অনুগত ঈশম আর সেনগুপ্ত পরিব ারেরঅনুগত নাগরালিভাই একই ধাতুতে গড়া, ভূমিহীন মুসলমান পরিবারগুলির অকথ্য দারিদ্র্যের ছবি অতীন বন্দ্যোপ াধ্যায় এঁকেছেন নির্ভুল সমাজদৃষ্টি দিয়ে, অসীম মমতায়। তবু 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' আর 'বিষাদবৃক্ষে' মৌলিক পার্থক্য আছে। কালাঙ্কের হিসেবে স্বাধীনতার পরপরই দেশ ছাড়ে ভৌমিক পরিবার। নৈরাজ্যের গুটি এই উপন্যাসে আছে, পরবর্তী পর্যায়টি নেই। কেন্দ্রীয় কিশোর চরিত্র সোনাঅর্জুন গাছের বাকলে ছুরি দিয়ে অক্ষর ফুটিয়ে তার নিদ্দিষ্ট উন্মাদ জ্যাঠামশাই মনীন্দ্রনাথের জন্য বার্তা রেখে গিয়েছিলেন 'জ্যাঠামশাই, আমরা হিন্দুস্থানে চলিয়া গিয়াছি, ইতি সোনা।' এই গল্প যেখানে শেষ হচ্ছে 'জ্যাঠামশাই, আমরা হিন্দুস্থানে চলিয়া গিয়াছি,ইতিসোনা।' এই গল্প যেখানে শেষ হচ্ছে 'বিষ াদবৃক্ষে'র যেন সূচনা সেখান থেকে। যারা পড়ে রইল মিহির সেনগুপ্ত তাদের অসহায় বেদনার কথাকার।

অবিশ্বাস, হিংসা, হানাহানিতে দীর্ণ এই সময়টিকে তুলে ধরা সহজ কাজ ছিল না। সবচেয়ে কঠিন ছিল সাম্প্রদায়িক সঙ্ক ীর্ণতা মুক্ত, নিরপেক্ষ অক্রোধী অবস্থানে দাঁড়ানো, বিশেষ করে কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে লেখক নিজেই যেখানে আক্রান্ত। কিন্তু মিহির সেনগুপ্ত এই অগ্নিপরীক্ষা সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছেন। তপন রায়চৌধুরী যথার্থ বলেছেন এই বইটিকে গৈরিকপন্থীরা কুচক্রের কাজে লাগাতে চেষ্টা করলেও সফল হবেনা কারণ মানবতাধর্মী 'বিষাদবৃক্ষ' থেকে তিনি যথার্থভাবে অসাম্প্রদা য়িক ছিলেন না, সেই শিক্ষা তিনি লাভ করেছেন এপারে আসার পর। 'ঐ সময়টায় আমি একটা কুসংস্কারাছন্ন, ধর্মভী এবং অকারণ নীতিবাগীশ হিসাবেই বেড়ে উঠছিলাম। ইস্কুলে যাবার পরও আমার এই মানসিক বদ্ধতা দূর হয়নি।' এর কারণটি নিহিত করা এবং বাড়িয়ে যাওয়া, হিন্দু হিন্দুই থাকুক, মুসলমানও থাকুক মুসলমান। সমবেতভাবে এরা যেন অসাম্প্রদা য়িক মানুষ না হতে পারে সেদিকে শাসকদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। তবে মিহির সেনগুপ্তের অকপট স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও পাঠক অনুভব করে ধর্ম ও সম্প্রদায়ভেদকে তুচ্ছ করে মানুষকে দেখার দৃষ্টি তিনি কৈশোরেই অর্জন করেছিলেন। মধ্যস্বত্ত্বলোপ হওয়ার পর তালুকদার ঘরের ছেলে মিহিরকে নির্মম জীবন সংগ্রামের মুখোমুখি হতে হয়, সেই সময়ে গ্রামের দরিদ্র সাধ ারণ মানুষ, তাঁর ভাষায় 'অপবর্গী'দের সঙ্গে অভিজাত সন্তান মিহিরের গভীর যোগাযোগ ঘটে। অনুমান করি ঐ যোগাযে াগেই তাঁকে মানুষ চিনতে শিখিয়েছিল, বর্ণাভিমান, আভিজাত্যের অহংকার, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি তখন থেকেই তাঁর চিত্ত থেকে স্খলিত হতে শু করে। আমার এই অনুমানের পক্ষে বহু উদ্ধৃতি গ্রন্থ থেকে দেওয়া যায়। ১৯৪৭ থেকে ১৯৬৩ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গে সংখ্যালঘুদের ক্রমশ ভঙ্গুর হতে থাকা সামাজিক অবস্থান, রাষ্ট্রশক্তির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রেরণায় মৌলব াদের বাড় বাড়ন্ত, শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের নিপায় বিষাদ ও একদা সমৃদ্ধ, সম্ভাবনাময় জনপদগুলির ওপর অশুভ শক্তির কৃষ্ণপক্ষবিস্তার, এই সব কিছুরই নিপুণ দলিলীকরণ ঘটেছে 'বিষাদবৃক্ষে'।

।।দুই ।।

'এই খাল এবং এই বৃক্ষ নিয়েই তো আলেখ্য।'

মিহির সেনগুপ্তদের সাবেকী আভিজাত্যময় বাড়িটির পিছন দিকে একটি খাল বয়ে যেত, বিকেলে যেখানে বড়খাল থেকে জোয়ারের জল আসত। বড় খালের পাড়ে ছিল এক জোড়া বিশাল রেনট্রি। এই পিছারার স খাল ও বড় খালের পাড়ের রেনট্রির কথাধুয়ার মতো বারবার গ্রন্থে এসেছে। পিছাবার স খাল ও বড় জোড়া রেনট্রি লেখকের প্রিয় প্রতীক। 'এরাই অ ামার স্মৃতির তাবৎ অনুকণাসহ এক অনিবার্য, সতত চৈতন্যময় এবং অসম্ভব মেদুরপ্রবাহ, যা আমাকে শয়নে, জাগরণে, স্ বপ্নে অথবা বিশ্রান্তেকখনওই ত্যাগ করে না।' পিছারার খাল যেন জলজ পুর্ববাংলার জীবন স্রোত, ঐ খালে হুটোপাটি করে কেটেছে লেখকের শৈশব, অভাবের দিনে ঐ খালের জলে মাছ ধরেছেন ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য, বৈকালী জোয়ারের জলে তিনি ম াকে গ্রামের অন্য মেয়ে বউদের সঙ্গে আনন্দে সাঁতরাতে দেখেছেন, গান গাইতে শুনেছেন। সে গানের টুকরো আমাদের মতো নাগরিক মানুষের মনে শচীনকত্তার 'কে যাস্ রে ভাটিগাঙ বাইয়া/ আমার ভাইধনের কইও নাইয়ার নিত বইলা' গ ানের অশ্রুবিধুর মূর্ছনা জাগিয়ে তোলে। পিছাবার খাল যেখানে বড়খালে মিশেছে তার উল্টোপাড়ের ছৈলা গাছের ঝো াপটি পেরোলেই ছিল লেখকের দাদীআম্মার বাড়ি। অসাম্প্রদায়িক চেতনা চিত্তে জাগিয়ে তোলার ব্যাপারে দাদীআম্মাই

তাঁর প্রথম ও প্রধান গু। বড়খালের ধারে রেনট্রি দুটির স্নিগ্ধ শীতল ছায়ায় স্থানীয় জমায়েতগুলি হত। বহু লোকাচরণ ওলে াকানুষ্ঠান যেমন সেখানে লেখক দেখেছেন তেমনি বিপরীতধর্মী হিংস্র সভাও কম দেখেননি। এই বৃক্ষ যেন কখনো ইতিহাস পুষ বামহাকালের ভুমিকা গ্রহণ করে, কখনো বা ঐ বৃক্ষকে মনে হয় জনপদের অধিদেবতা, যার স্নেহাসত্ত শিকড়ের আহ্বান উপেক্ষা করে দুইসম্প্রদায় পরস্পরকে আঘাত করে অভিশাপগ্রস্ত হয়েছে। ঐ মহাবৃক্ষের সঙ্গে যেন জড়িয়ে রয়েছে আধিব াসীদের উৎপত্তি, বিকাশের বিনাশের ইতিবৃত্ত। ভাবীকালের কাছে সেই শিকড় সন্ধান কোনো দিন জরি মনে হবে এই আশ াবাদী ভাবনা দিয়ে গ্রন্থ শেষ হয়েছে। এইখাল, বৃক্ষ এবং এদের ঘিরে গড়ে ওঠা জনপদের যে আখ্যান মিহির সেনগুপ্ত বিবৃত করেছেন তা পড়তে গিয়ে বিন্দুতে সিন্ধুদর্শনের উপমাটি মনে জাগে। বরিশালের প্রত্যন্ত গ্রামের জীবনচিত্রে গোটা পূর্ববঙ্গের ছবি ধরা পড়েছে। লেখকের নিজের ভাবনায়, ‘আমার মতো, হয়ত, আরও হাজারো জীবনই -এরকম দুঃখময়ত ার বিষণ্ণতায় তাদের জীবন অতিবাহিত করে, তাঁদের পিছাবার ঘাটের শূন্যতাকে হৃদয়ে নিয়ে নিঃশেষ হলেন, তার খবর ইতিহাসে কোথায় থাকে? লোকেরা শুধু গোদা কথায় দেশভাগ আর তার কার্যকারণ ব্যাখা করে।’

এই বছর বঙ্গভঙ্গের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে নিজেদের ইতিহাসকে আমরা ফিরে দেখার চেষ্টা করছি। আজ আর আমাদের সন্দেহ নেই সাতচল্লিশের দেশভাগের বীজ বোনা হয়েছিল উনিশশো তিন সালেই। ঐক্যবদ্ধ বাংলাকে শত্রু হিসেবে চিনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বাংলা ভাগের হীন চক্রান্ত করেছিল, তাকে ব্যর্থ করার জন্য জেগে উঠেছিল শক্তিশালী গণ আ ান্দোলন। কিন্তু ব্রিটিশকে তখনকার মতো খে দেওয়া সম্ভব হলেও, নিজেদের ভিতরের ভাঙন আমরা খতে পারিনি। রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করে বলা যায় ঘরে ছিদ্র না থাকলে শনি কি প্রবেশ করতে পারে। আমাদের দুই সম্প্রদায়ের স ম্পর্কে কোথাও ভেদবুদ্ধির ছিদ্র ছিল যা দিয়ে বিদ্বেষের কালনাগিনী অবাধে প্রবেশ করেছে। এই ধবংসের দায়ভাগে দুই স ম্প্রদায়েরই সমান অংশ। মিহির সেনগুপ্ত যেমন বলেছেন ‘এক ভস্ম আর ছার। দোষগুণ কব কার? সেইকথা। দোষেগুণে আমরা উভয় সম্প্রদায়ই তুল্যমূল্য।’ বিদ্বেষের রাক্ষুসে চেহারা তো তো শুধু স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী দাঙ্গাতেই শেষ হয়নি। শুধু পূর্ববঙ্গের হিন্দুসম্প্রদায় এর একমাত্র বলি নয়। অতি সাম্প্রতিক কালে ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের বুকে গুজরাটে সংখ্যালঘু নিধন এখনো দগদগে ক্ষতচিহ্ন হয়ে রয়েছে। আঘাত এবং প্রত্যাঘাত, রায়ট এবং প্রত্যুত্তরে আরো রায়ট, রত্তাত্ত ইতিহাসের কলঙ্কময়, লজ্জাজনক পুনরাবৃত্তি ঘটেই চলেছে উপমহাদেশে। মিহির সেনগুপ্তের আখ্যানটি এই ঐতিহাসিক ভুল সম্পর্কে প্রখর প্রতিবাদী চেতনা জাগিয়ে তোলে। বইটিকে তাই অবশ্য পাঠ্যের তালিকায় রাখতে ইচ্ছে করে। পিছার ার খালের বিত্ত সামন্ততান্ত্রিক ছাঁচে ঢালা হিন্দু মধ্যবিত্ত পরিবারে সাম্প্রদায়িক ঘৃণাবোধ কীভাবে বিষ ছড়াতো তার অনুপুঙ্খ বর্ণনা লেখক দিয়েছেন। এ বাবদে তাঁর দৃষ্টি একান্ত নির্মোহ। যে বুড়ি পিসিমা ও নগেন জ্যেঠিমার নানা পার্বণ ও ব্রতকথার আবেগাতুর বর্ণনা ‘বিষাদবৃক্ষের’র সূচনাপর্বকে মধুর করে রেখেছে তাঁরাও এই ঘৃণার বাতাবরণের বাইরে নন। ‘যে বুড়ি পিসিমার ব্রতকথা নিয়ে আমার এই সাতকাহন বাক্‌বিন্যাস, তিনি কি প্রতিনিয়ত এদেরকে, জাত তুলে শ াপশাপান্ত, বাপবাপান্ত করে নি? তিনি কি এদের সামান্য ত্রুটিকে উপলক্ষ করে বলতেন না --- এ তোগো জাতের দোষ। এ কারণে এই অনাচারের দায়ভাগ আমাদের বহন করতে হবে, তা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু তাতেই বা পিসিমার ব্যত্তিক দায় কি?’ ব্যত্তির দায় নেই এ কথা যেমন সত্য তেমনি প্রতিকূল অবস্থার চাপে কিন্তু পিষে যেতে হয় ব্যত্তিকেই। উপমহাদেশের জ াতককে অন্তরে বহন করতে হয় অবিশ্বাস, গোপন ভয়, চোরা সন্দেহ। বিদ্বান, বুদ্ধিমান, মুত্তমনা মানুষকেও তা রেহাই দেয়ন া। প্রসঙ্গত্রমে, মনে পড়ে যাচ্ছে অমিতাভ ঘোষের ‘ইন অ্যান অ্যান্টিক ল্যান্ড’ গ্রন্থে উল্লিখিত একটি ঘটনা। মিশরের একটি শান্ত গ্রামে গবেষণাসূত্রে অবস্থানের সময় তাঁকে স্থানীয় কয়েকজন লোক ধর্মচিহ্ন নিয়ে কয়েকটি কৌতূহলী প্রশ্ন করে। ব্যাপ ারটা তাঁকে এমন সন্ত্রস্ত করে তোলে যে ভয়ে তিনি দ্রুত স্থানত্যাগ করে পালিয়ে আসেন। গেঁয়ো বন্ধু নাবিল ভেবেই পায় ন া কেন তার ভারতীয় বন্ধু এতো আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। নাবিলের সঙ্গে নিজেতর মানসিকতার পার্থক্যটা বুঝতে পারেন লেখক, তাঁর মনে পড়ে যায় ভয়ংকর এক শৈশব স্মৃতি। সম্ভবত পিতার দূতাবাসে চাকরির সূত্রে বাল্যে তিনি ঢাকায় থ াকতেন। ঢাকা পিতৃকুল ও মাতৃকুল দুদিক দিয়েই তাঁর দেশ, কিন্তু ঘটনাচত্রে বিদেশ কারণ সময়টা ১৮৬৪ সালের জানুয় ারি। তখনো অবশ্য ঢাকায় তাঁদের কিছু আত্মীয় স্বজন ছিলেন। শহরে দাঙ্গা বাধলেই উৎপীড়িত হিন্দু জনতা তাঁদের বাগ ানওলা মস্ত বাড়িতে পালে পালে এসে আশ্রয় নিত। এক রাতে যখন বাড়ি ছেয়ে গেল শরণার্থীতে তখন চারপাশ গিরে ফেলল সংখ্যাগু সম্প্রদায়ের মানুষ, তাদের হাতে জ্বলন্ত মশাল আর ধারালো অস্ত্র। সেই ভয়াবহ রাতের স্মৃতি তাঁর

শিশুমনে গেঁথে গিয়েছিল। সেদিনই কলকাতাতে লেখকের অবচেতন থেকে সেই আদিমভয়ই উঠে এসেছিল মিশরের গ্রামে নিরীহ কিছু প্রশ্নে। নাবিলকে অবশ্য এই ভয়ের প্রকৃতি বোঝানো যাবে না জানতেন লেখক, কারণ, ‘The fact was that despite the occasional storms and turbulence their country had seen, despite even the wars that some of them had fought in theirs was a world that was far gentle, far less violent, very much more humane and innocent than mine.
I could not have expected them to understand an Indian’s terror of symbols.’
মিহির সেনগুপ্তও গাজির দলের শোভাযাত্রা করে তাদের বাইর দিকে আসার বর্ণনা দিয়েছেন। যদিও গাজি নাগি আক্রমণ করতে আসেনি, ভরসা দিতেই এসেছিল, তাকে কোনো হিন্দুই বিশ্বাস করেনি। এর পরেই পিছারার খালের জগতে পাক দেশত্যাগের হিড়িক পড়ে যায়। কোনো বড় দাঙ্গা যদিও সেখানে ঘটেনি কিন্তু পঞ্চাশ একান্নর দাঙ্গা শহরে বন্দরে ঘটলেও গ্রামে তার কাঁপুনি এসে পৌঁছেছিল, পাঁচশ বছরের পুরনো সামাজিক ভিতে ফাটল ধরিয়ে কায়েম হয়েছিল ভয়ের রাজত্ব। লোকসংস্কৃতি ও সাহিত্য সম্বন্ধে মিহিরের গভীর জ্ঞান, সমাজের নিম্নবর্গে হিন্দুমুসলমান মিলে যে অসামান্য এক সহিষ্ণু সংস্কৃতি রচনা করেছিল বারবার তিনি তার উল্লেখ করেছেন, ‘বাংলাদেশে হিন্দু আর মুসলমানে যে রকম মেশামেশি হয়েছিল, ভারতবর্ষের আর কোথাও বোধহয় তেমনটি হয়নি।’ দেশভাগের দুর্মর প্রহারে এই বিকাশের ধারা স্তব্ধ হয়ে গেল। পড়ে রইল শুধু ভয় আর পারস্পরিক ঘৃণা। হিন্দুদের ক্রমিক উন্মূলনের বিবরণ দিতে গিয়ে অত্যন্ত সঙ্গত প্রশ্ন তিনি তুলেছেন, হিন্দু উচচবর্ণরা অত্যাচারী ছিল সন্দেহ নেই কিন্তু রাষ্ট্রের কোপ হিন্দু নিম্নবর্ণের ওপরও সমানভাবে বর্ষিত হল কেন? মুসলিম লিগ ও পাকিস্তানপন্থীরা বারবার জানিয়েছিলেন তাঁদের বিরোধ শুধু অর্থনৈতিক হিসাবে শোষক সম্প্রদায় উচচবর্ণের হিন্দুর সঙ্গে নিম্নবর্ণ হিন্দু তাঁদের সগোত্র। এমনকি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ও আমরা উচচবর্ণের বিরুদ্ধে এই সংঘবদ্ধতার নজির খুঁজে পাচ্ছি। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন কালে বাখরগঞ্জ জেলার ওরাকান্দিতে রাজেন্দ্রনাথ মণ্ডলের নেতৃত্বে নমশূদ্রদের সভায় বঙ্গভঙ্গবে স্বাগত জানানো হয়েছিল এবং একটি প্রস্তাবে বলা হয়েছিল নমশূদ্রদের প্রতি হিন্দুদের চেয়ে মুসলমানরা বেশি সহানুভূতিশীল এবং পূর্ববঙ্গে যেহেতু তাঁরাই দুই প্রধান সম্প্রদায় নতুন ব্যবস্থা মুসলমানদের মতো একই সুযোগ সুবিধা দাবি করবেন নমশূদ্ররাও। বাস্তবে কিন্তু দেশভাগের সময় দেওয়া প্রতিশ্রুতি সমূহ অচিরে শূন্যে মিলিয়ে গেল। জেনারেল আইয়ুব খান ক্ষমতা দখল করার পর পরমাশর্চর্য এক বুনিয়াদি গণতন্ত্র চালু করার সময় এমনভাবে কলকাঠি নাড়া দেওয়া হয় যে পুব বাংলার মাটি থেকে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের শিকড়ও ছিঁড়ে ফেলা হতে থাকে। ‘ভাটিপুত্রের অপবর্গ দর্শন’ নামে সাম্প্রতিক একটি লেখায় মিহির সেনগুপ্ত তাঁদের ধোপা ঝি ‘ছোডি’র মুখে এমন কয়েকটি প্রশ্ন দিয়েছেন শত বৎসরেও হয়তো তার ‘উত্তর মেলে না।’ ‘ হেই লাড়ইয়ামাখা বানইয়ার পোয় যে কইছিলে যে ল্যার লাশের উপর দিয়া দ্যাশটা ভাগ অইবে, হেয়ার কী অইলো? ... তয় এ্যারাকি এহন এরহমই কাডবে আর খ্যাদাইবে মোগো? ... আর মোরা ছাড়ইয়া কাডইরা সভ ফ্যালাইয়া থুইয়া ইন্দুস্থান চলইয়া যামু সতপুত্রযের দখল ছাড়ইয়া?’ আজ বাংলাদেশে ‘ছোড়ি’র মতো প্রশ্নতোলার সাহস হয়তো আর কারো হবেনা। প্রাসঙ্গিক বোধে বাংলাদেশের ‘ছোড়ি’র মতো প্রশ্ন তোলার সাহস হয়তো আর কারো হবেনা। প্রাসঙ্গিক বোধে বাংলাদেশের পঞ্চাশ বৎসরের জনগণনার হিসেবটি একটু দেখা যাক, এটি রত্নের ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

।। বাংলাদেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনসংখ্যার হার ।।
সেন্সাস বছর মুসলমান হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান অন্যান্য
১৯৪১ ৭০.৩ ২৮.০ ---- ০.১ ১.৬
১৯৫১ ৭৬.৯ ২২.০ ০.৭ ০.৩ ০.১
১৯৬১ ৮০.৪ ১৮.৫ ০.৭ ০.৩ ০.১
১৯৭১ ৮৫.৪ ১৩.৫ ০.৬ ০.৩ ০.২
১৯৮১ ৮৬.৬ ১২.১ ০.৬ ০.৩ ০.৩
১৯৯১ ৮৮.৬ ১০.৫ ০.৬ ০.৩ ০.৩
ভারতের সরকারি ক্যাম্পগুলিতে উদ্বাস্তুদের আশ্রয় গ্রহণের সংখ্যাভিত্তিক হিসেবে প্রফুল্ল চক্রবর্তী তাঁর ‘বড়ন্দ্ব ত্ত্বজন্বন্দ্রপু

প্লন্ধ' গ্রন্থে বিশদভাবে দিয়েছেন। এইসব হিসেবে চোখ রেকে পুর্ববঙ্গে হিন্দু জনসংখ্যার ক্রমিক ক্ষয়টি আমরা বুঝে নিতে পারি। আমাদের চেতনায় মিহির সেনগুপ্তের কন্ঠের সঙ্গে মিলে যায় সালাম আজাদের প্রতিবাদী স্বপ্ন। তাঁর 'হিন্দু সম্প্রদায় কেন দেশত্যাগ করছে' গ্রন্থে আজাদ পর্যন্ত একটিও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়নি। ... দাঙ্গা হয় দুই পক্ষে। কিন্তু এখানে এখন এক পক্ষ নীরব থেকেছে। মার খেয়েছে। পালিয়ে বেড়িয়েছে। অপর পক্ষ মেরেছে। ... বাংলাদেশে এই সাম্প্রদায়িক নির্য াতন প্রতিদিন ঘটছে।' মিহির সেনগুপ্তের অভিজ্ঞতা। পাকিস্তানী আমলের, আজাদ লিখছেন স্বাধীন বাংলাদেশের কথা কিন্তু সংখ্যালঘুর অদৃষ্ট একই। তারা চলছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার পথে।

।। তিন ।।

'তোর মুববীগো স্বভাব নষ্ট অইছে, বুদ্ধি ভষ্ট অইছে। হেরা তোরে ইস্কুলে দেনায়। আমি তোর ব্যবস্থা করইয়া দিতাছি খাড় া।'

দাদীআম্মার এই উক্তিতে একদিকে আছে হিন্দু পরিবারের কর্তাদের মানসিক অবক্ষয়ের ঈঙ্গিত অন্যদিকে হতাশার অন্ধক ারথেকে মিহিরের উত্তরণের আলোক আভাস। আত্মশক্তি ও আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেললে মানুষের বোধহয় আর বিশেষ কিছু বাকি থাকে না। পূর্বপাকিস্তানে ঘটনাপরম্পরার ধাক্কায় সংখ্যালঘু সমাজ অনুভব করতে পেরেছিল নিজেদের সংরক্ষণের ক্ষমতা তাদের আর নেই ফলে তাদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল নৈরাশ্য, সার্বিকভাবে মূল্যবোধের ধস, বিপুল অবসাদ, অতীতসর্বস্ব আলস্যময়তা, কর্মোদ্দীপনার সম্পূর্ণ অভাব। এই পতনোন্মুখ সমাজের প্রাত্যহিক গ্লানিময়তার ছবি আঁকতে হয়েছে লেখককে। এই ছবি এক কথায় ভয়াবহ। পূর্ববঙ্গে বহু শতাব্দী ধরে জমিজিরাত বা নানা ধরনের বৃত্তির ওপর নির্ভর করে হিন্দু সমাজের একটি দৃঢ় বনিয়াদ গড়ে উঠেছিল, মিহির এইবনিয়াদকে সম্পূর্ণ ধবংস হতে দেখেছেন। তঁ ার চোখের সামনে শস্যসমৃদ্ধ গোলাগুলি রিক্ত হয়ে গেল, আনন্দময় ব্রত, উৎসব লোকাচারের দিনযাত্রা অতীত হয়ে গেল। সজীব সুন্দর গৃহস্থালিগুলি প্রায় শ্মশানে পরিণত হল। কয়েকটি উপাখ্যানের মাধ্যমে তিনি এই ধবস্ত জীবনকে বিশদ করেছেন। ডাক্তার জেঠার বাড়ির কাহিনীতে ধরা পড়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে পারিবারিক স্নেহ প্রীতির বন্ধনগুলি কীভ াবেখসে যাচ্ছিল। পারিবারিক পবিত্রতা, নীতিবোধ স্থলিত হয়ে শুধুমাত্র টিকে থাকার হাঁমুখ জেগে উঠছিল। বাড়ির যুবতী মেয়েদের দেহব্যবসায়ে নামচ্ছিলেন অর্থগৃধ কাকিমা। আশেপাশের লুদ্ধ চরিত্রহীন মানুষ তাদের তাড়া করছিল, কুট্টি ও ম ালেকের, হরিণী - বাঘ প্রতিমঘটনাটি স্মরণীয়। অবশেষে কন্যাপণ নিয়ে অযোগ্য পাত্রে এইসব মেয়েদের বিবাহ দেওয়া হয়। শেষ পর্যন্ত ডাক্তার জেঠার মতো একদা সম্পন্ন, শ্রদ্ধেয় মানুষকে লেখক ভিক্ষাও করতে দেখেছেন। সংখ্যালঘুদের পক্ষে এই অসহনীয় পরিস্থিতিকে পাল্টানো সম্ভব ছিলনা কারণ রাষ্ট্রব্যবস্থার নিগূঢ় অভিসন্ধিতেই তাদের পায়ের নীচের জমি সরে যাচ্ছিল। সর্বশক্তিমান রাষ্ট্রের বিদ্ধে কিছু না করতে পেরে তারা হয় ভারতে পালাচ্ছিল নয় যাপন করছিল এক অপজীবন।

'লোচচা, লম্পট এবং লুম্পেনদের সে সময় রাষ্ট্রই ছেড়ে দিয়েছিল সংখ্যালঘুদের অবশিষ্টতম মানুষের উচ্ছেদ কল্পে।' রক্ষকরাই যে ভক্ষক নায়েবের মেয়েকে দারোগার ধর্ষণের কাহিনীতে লেখক তার স্পষ্ট পরিচয় রেখেছেন। কিন্তু ভাবতে অবাক লাগে যে অপদার্থ শক্তিহীন সমাজ মেয়েদের রক্ষা করতে পারেনি, জাত রক্ষা করতে সেই নির্দয় সমাজ কিন্তু ছিল বড়ই তৎপর। ধর্ষিতা, লুন্ঠিতা হিন্দু মেয়েদের পরিবারে ফেরার পথ সমাজ বেশ শক্ত করেই বন্ধকরেছিল। বরিশাল শহরে পতিতাবৃত্তিধারিণী মাসিমার কাহিনীটি হয়তো এমন হাজার হাজার কাহিনীর একটি। চকিতে মনে পড়ে যায় জ্যোতির্ময়ী দেবীর 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' উপন্যাস কিংবা লাহোরের দাঙ্গার পটভূমিতে লেখা 'সেই ছেলেটা' গল্প।

হিন্দু সমাজের বিপর্যয়কে প্রকাশ করতে গিয়ে মিহিরের প্রধান অবলম্বন হয়েছে তাঁর নিজস্ব পরিবার - কথা । একটি পরিব ারের, পাঁচালিতে লক্ষ লক্ষ হিন্দু পরিবারের সর্বনাশের অলিখিত কাহিনী ধবনিত হয়েছে। তালুকদারি আমলে অভিজাত সেনগুপ্ত পরিবার অভ্যস্ত ছিল সামন্ততান্ত্রিক দিনচর্যায়, ছিল দোলদুর্গোৎসব, নাটক থিয়েটার, আরাম আয়েস। বৈঠকখ ানা ঘরে নানা জন্তু জানোয়ারের মুণ্ড, চামড়া ইত্যাদির পাশাপাশি বীরত্ব ও প্রজাপীড়নের নিদর্শন স্বরূপ সোয়াহাত 'জোত া'ও শোভা পেত। দেশভাগের পরও দীয়তাং ভুজ্যতাং অব্যাহত ছিল, মধ্যসত্ত্বলোপের পর পরিবারটি যথার্থ দুর্দৈবের স ম্মুখীন হয়। সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি ও নারী কোনোটিই আর তখন নিরাপদ নয়। বয়সে বড়ো ছেলেমেয়েদের নিয়ে পরিব

ারের বৃহদংশ পাড়ি দেয় ভারতে। জেঠা ও বাবার কর্তৃত্বে গ্রামে থেকে যান মিহিররা। এই কর্তারা যৎপরোনাস্তি দায়িত্বজ্ঞ ানহীনতার পরিচয় দিয়ে পরিবারের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দেবার ব্যবস্থা প্রায় পাকা করে ফেলেছিলেন। যদিও জেঠা ও বাবার চরিত্র সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী তবে তমোগুণে দুজনই কাছাকাছি। মিহির পষ্টাপষ্টি বলেননি কিন্তু পাঠকের বুঝতে অসুবিধে হয় না যে জেঠা খাসজমি বিক্রি ইত্যাদির ব্যাপারে তাঁর বাবাকে ভালোরকম ঠকিয়েছিলেন। আর্যলক্ষ্মী ব্যাঙ্কে তাঁর গোপন টাকা জমানো ছিল এমনকথা ভ্রাতুষ্পুত্র শুনেছেন। এই ইতিহাস পূর্ববাংলার হিন্দুদের ঘরে ঘরে পুনরাবৃত্ত হয়েছে। বাড়ির তৈজসপত্রাদি বিক্রি করে খাওয়ার সময়ও তাঁরা সামন্ততান্ত্রিক দাম্ভিকতা পরিত্যাগ করেননি, চাকরকে দিয়ে জিনিসপত্র বাজারে পাঠিয়েছেন। ঠকতেও তারা রাজি কিন্তু মান খোয়ানো ? নৈব নৈব চ। মিহির ও তাঁর ছোট ভাইকেপ্রচণ্ড কায়িকশ্রমের দিকে ঠেলে দিতে তাঁদের কুণ্ঠা হয়নি। মিহির গো চরিয়েছেন, শটির প ালো বিক্রি করে অন্নসংস্থান করেছেন, তাঁর জেঠা বা বাবা উদাসীন দর্শক হয়ে থেকেছেন। ছেলে মেয়েদের উঞ্ছবৃত্তি তাঁদের লজ্জিত করেনি। যদিও গ্রামীণ দলাদলিতে, ক্ষমতা ধরে রাখার রাজনীতিতে জেঠা একজন দক্ষ খেলোয়াড়। ইউনিয়ন ক াউন্সিলের নির্বাচনে জেঠার ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে মিহিরের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য, ‘উপযুক্ত ক্ষেত্রে বিকাশ লাভ করলে তিনি একজন ছোটখাট হিটলার হতেন এবং গোটা দেশের নিম্নবর্গীয় এবং মধ্যবর্গীয় হিন্দুমুসলমানদের concentration camp এ না পাঠিয়ে ও শুধুমাত্র পারস্পারিক বিরোধিতার মধ্যে ঠেলে দিয়ে ব্যাপক বিধবংস ঘটাতে সক্ষম হতেন।’ এই ধুরন্ধর রাজনীতিবিদের ব্যক্তিত্ব যথারীতি খুবই প্রবল ছিল। মিহিরের বাবা তাই আজীবন দাদার ছায়াতে আলস্যনিমগ্ন থ াকতে চেয়েছেন। দুই ভাই গত্যন্তরনা দেখে স্কুলে চাকরি নিয়েছিলেন বটে কিন্তু তাঁরা যে কেউ ভালো শিক্ষক ছিলেন না মিহির তা জানিয়েছেন। জাত্যভিমান দুজনের মধ্যেই প্রখর কিন্তু জেঠাকে বাবার থেকে অনেকবেশি সাম্প্রদায়িক বলে মনে হয়। তাঁর হীন প্রতিশোধ স্পৃহার নানা ইঙ্গিত কাহিনীতে আছে। দাদী আম্মার সাহায্যে মিহির তালি স্কুলে ভর্তি হতে চাইলে তিনি বায়না ধরে ছিলেন মিঞাগো ইস্কুলে পড়ামুনা, ভাইপো মূর্খহয়ে থাক, শুধু যবনসংসর্গ না কক। পড়ে অবশ্য ঐ স্কুলে নিজে চাকরি নিতে তাঁর আটকায়নি। নিকটবর্তী অঞ্চলে হিন্দুমুসলমান উভয়ের উপরই মিহিরের বাবার একটা প্রভাব ছিল। তিনি ছিলেন পাঠি খেলায় দক্ষ, নাটক থিয়েটারে নিপুণ, সুকণ্ঠের অধিকারী, সাহিত্য প্রেমিক, আবেগ প্রবণ এক স ামন্তপুষ। মিহিরের মা বাবার গাঢ় দাম্পত্য সম্পর্ক নিয়ে এই গ্রন্থের মর্মস্পর্শী একটি অংশ রচিত হয়েছে। এমন গুণী একজন মানুষের দাদার ওপর নির্বিচার নির্ভরতা এবং পুত্রকন্যাদের বিদ্যার্জনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্যের কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। এমনকি বরিশাল শহরে মিহির যখন প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে যাচ্ছেন তখনো তিনি অভিভাবক হিসেবে কে ানো দায়িত্ব পালন করেননি। কলেজে পড়ার ব্যবস্থা করার তো প্রশ্নই আসে না।। জ্যেঠা যখন অকারণে কিশোর মিহিরকে চ াকর দিয়ে অপমান করিয়েছেন তখনো জ্যেষ্ঠের প্রতি শ্রদ্ধাভরে তিনি চুপ করে থেকেছেন। বাড়ির কর্তাদের এই অমানবিক ব্যবহার একবার মিহিরকে আত্মহত্যা করার দিকেও ঠেলে দিয়েছিল। মিহির লক্ষ করেছেন নিম্নবর্গের মানুষ সন্তানদের শ্র মকে শ্রদ্ধার চোখে দেখেন অথচ তাঁরা যেনজেঠা ও বাবার বেঠ - বেগারি প্রজা, যাদের শ্রমের ফসলের উপর তাঁদের পুষ ানুক্রমের অধিকার আছে। সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতার এই কদর্যরূপ অবশ্য দেশভাগের পর এপারে উদ্বাস্তু কলো নিগুলিতেও আমরা কম দেখিনি। হিন্দু সমাজের মানসিক অবক্ষয় শুধু পূর্বপাকিস্তানে সীমাবদ্ধ ছিল না, তবে তা ভিন্ন ইতিহাস, এখানে তার আলোচনা অবান্তর। পরিবারে সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব নিঃসন্দেহে মিহিরের মা লাবণ্যপ্রভা। সহিষুণ্তা, মমতা, দায়িত্ববোধের, নিবিড় পরিচয় রয়েছে এই অনন্য মাতৃমূর্তিতে, শুধু নিজের সন্তান নয়, যিনি যৌথ পরিব ারের হীন চক্রান্তকে প্রতিহত করে তিনটি অনাথ সপত্নী সন্তানের মাতৃপদেও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। সংস ারের দুর্দশায় পরিশ্রম দিয়ে, স্নেহ ও শুশ্রূষা দিয়ে তিনিই সন্তানদের লালন করেছেন। তিনিই তাদের আত্মিক শক্তির উৎস ছিলেন।

বৈরী রাষ্ট্রব্যবস্থায় অমানবিক আবহে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একটি বালকের আত্মনির্মাণের ইতিহাসে নৈরাশ্য যেমন নীরন্ধ্র, তারই মধ্যে প্রোজ্জ্বল আলোকপুষ কীর্তিপাশা স্কুলের রেক্টর স্যার অশ্বিনীবাবু। লাবণ্যপ্রভার দেশাত্মবোধ, স্মৃতিবিধুর সঙ্গীত মিহিরের মধ্যে যে সংস্কৃতি মনস্কতা, আত্ম মর্যাদাবোধ বুনে দিয়েছিল তা বহুগুণিত হয়েছে পরে অশ্বিনীবাবুর সাহচর্যে। এর অ াগেই অবশ্য তালি স্কুলের হাতেম মাঝি স্যার মিহিরকে শিক্ষার পথে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে পূর্বপাকিস্তানে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস ঘৃণা প্রায় তুঙ্গে পৌঁছেছিল। এই ঘন অন্ধকার বাতাবরণেৰ মধ্যে

মিহির সৌভাগ্যক্রমে দেখেছেন দাদীআম্মা,হাতেম মাঝি, অধ্যাপক কবীর চেধুরী, অধ্যক্ষ মেজবাহাল বার চৌধুরীর মতো ম ানুষদের। তিনি লক্ষ করেছেন সাধারণ মানুষরা সবাই মোটেই মুসা, জববর বা কালেম নয়। হিন্দুদের ক্রমিক দেশত্যাগে সংখ্যাগু সম্প্রদায়ের মানুষদের অনেকেই বিষণ্ণ। বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে পড়ার সময় জেঠা বা বাবার সংকীর্ণ সম াজচেতনার প্রভাব কাটিয়ে তিনি অন্য এক বোধের জগতে উত্তীর্ণ হন, 'আমি ব্যক্তিকএবং পারিবারিক সুখ দুঃখের সীম াবদ্ধতা কাটিয়ে বৃহত্তর দুঃখের জগতে প্রবেশ করতে চলেছি, অহীন হাত ধরে আমায় নিয়ে যাচ্ছে। সেখানে ঘৃণা ব্যাপারাট া নীচের থেকে উপর দিকে প্রধাবিত। এতদিন সেটাকে শুধু উপর থেকে নীচের দিকে প্রবহমান দেখতেই অভ্যস্তছিলাম।' মিহিরের রাজনৈতিক চেতনা এই সময় থেকেই ভিন্নমাত্রা পায়। অবক্ষয়ী হিন্দুসমাজের মালিন্য পার হয়ে তিনি মানবধর্মে পৌঁছতে পারেন।

।।চার ।।

'তফসীর মিঞা বলতেন, এখানের সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক বুনিয়াদটাই ধসে গেছে। শুকনো গাছে পানি দিলে কী পাতা গজায়?'

বিষাদবৃক্ষ কোনো অর্থেই একটি পারিবারিক আখ্যান বা শুধু পূর্ববঙ্গের হিন্দু সম্প্রদায়ের দুর্দশার চিত্রমালা নয়। এই গ্রন্থে লেখকের নির্দিষ্ট একটি তত্ত্ব খুবই সুস্পষ্ট ভাবে উচচারিত হয়েছে। নদীমাতৃক একটি সুফলা দেশে স্বাভাবিক বিক াশের ধারা স্তব্ধ হয়ে কীভাবে সামগ্রিক শূণ্যতা সৃষ্টি হল, শুধু সংখ্যালঘু নয়, সংখ্যাগুদের অস্তিত্বেও কীভাবে চেপে বসল অন্তহীন 'জাহিলিয়াৎ', মিহির তার ভাষ্যকার। হিন্দুদের দেশত্যাগের ফলে যে ভয়াবহ শূন্যতা তৈরি হয়েছিল মিহিরের মতে তা পূর্ববঙ্গের সামাজিক কাঠামোকে সম্পূর্ণ ভেঙে দিয়েছিল। পারস্পরিক যোগাযোগে, বিভিন্ন বৃত্তিজীবী মানুষের নির্ভরতাসূত্রে গ্রামীণ জীবনে যে অর্থনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিকজগত শতশত বৎসর ধরে গড়ে উঠেছিল তা চূর্ণ হয়ে যাব ার সর্বনাশ শুধু হিন্দুর নয়, অভিশপ্ত হয়েছে মুসলমান সমাজও। তিনি নির্দ্বিধায় জানিয়েছেন 'ভূস্বামী মাত্রেই অবশ্য ডাক াত ছিলেন এবং আহমেদ মোল্লাদের মতো ডাকাতদের সৃষ্টিও তাঁদেরই অবদান। ... আমার এই এলাকার তাবৎ ইতিহ াসই হচ্ছে জমি ডাকাতির ইতিহাস।' কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও মানসিক মূল্যবোধের বর্ণমালা সে সমাজে পারস্পরিক আত্মীয়তা সূত্রে সম্প্রদায় নির্বিশেষে বর্তমান ছিল। কিন্তু স্বাধীনতা উত্তর কালে ডাকাতি, লুন্ঠন, ধর্ষন, উচ্ছেদ যে মাত্রা পেলে তাকে তিনি বোতল থেকে দৈত্য বেরিয়ে আসার সঙ্গে তুলনা করেছেন। সংখ্যালঘুর বহুলাংশে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার পরে সংখ্য াগুরাই নিশ্চিত ভাবে এই দৈত্যের খাদ্যে পরিণত হল। মৌলবাদের ছত্রছায়ায় অশুভশক্তির যে আবাহন ঘটেছিল তার র াহুগ্রাস থেকে বাংলাদেশেরযেন মুক্তি নেই। মৌলবাদের আগ্রাসনের তিনি প্রত্যক্ষদর্শী, কীভাবে পূর্ববঙ্গের লোকায়ত সংস্কৃতি ধবংস করে মোল্লাতন্ত্র নিজেদের রাজত্বকায়েম করল তার বিশদ বর্ণনা আমরা এই গ্রন্থে পাই। 'হিন্দু নিম্নবর্ণীয়দের দেশত্যাগ শু হলে এই সাংস্কৃতিক মূলে কুঠারঘাত করে।ধর্মীয় কড়াকড়ি, সামাজিক তথা রাষ্ট্রীয় রক্তচক্ষু ও মোল্লাদের এই জ্বিহাদের জন্য যথেষ্ট মনে না হওয়ার তারা এই সব সংস্কৃতির মাধ্যমগুলোর ভিতরে অনুপ্রবেশ করে তার একটা সাম্প্রদা য়িক আকৃতি দেয়।' ভি. এস. নাইপলের সমাজচেতনা বা রাজনীতিবোধের সঙ্গেমিহির সেনগুপ্তের কোনোই সমধর্মিতা নেই কিন্তু এই মুহূর্তে মনে পড়ে যাচ্ছে 'Beyond belief' গ্রন্থে পাকিস্তানের সমাজকে অনুরূপ শূন্যগর্ভ, অন্তঃসারশূন্য, ধর্মীয় উন্মাদনায় পূর্ণ এবং বিভ্রান্ত বলে মনে করেছেন নাইপল। দীর্ঘ দিন ধরে গড়ে ওঠা শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে যে সমাজ অস্বীকার করে তার মূলেই যেন কুঠারাঘাত হয়। মিহিরের কলমে ধরা পড়েছে এই দেউলিয়াপনা। হিন্দু গ্রামে ঐতিহ্যমণ্ডিত স্কুলবাড়িগুলি ভেঙে , দরজা, জানলা লুঠ করে চাষজমি তৈরি হচ্ছে, অন্যদিকে শিক্ষার জন্য উন্মুখ মুসলমান সমাজ উপযুক্ত পরিকাঠামো ও শিক্ষক ছাড়াই স্কুল স্থাপন করছে। লেখকের ভাষায় এ হল 'অঢেল সামাজিক অর্থ - শ্রাদ্ধ'। হিন্দু মধ্যবিত্তের দেশত্যাগে এক নতুন মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী তৈরি হয়েছে কিন্তু অতি দ্রুত এই শ্রেণী রূপান্তরেরপ্রক্রিয় াকরণ হবার ফলে রয়ে গেছে নানা ফাঁক। কিন্তু ভূমিহীন মানুষ, কিছু আধিয়ার হয়তো উচ্ছেদ হওয়া হিন্দুদের জমি পেয়েছেন কিন্তু মনে রাখতে হবে বাংলাদেশে তেমন কোনো ভূমিসংস্কার আইন হয়নি। সম্ভবত অনেকেই এ ব্যাপারে একমত হবেন যে সার্বিক ভাবেসাধারণ মানুষের অবস্থার কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেনি। ১৯৬৩ তে দেশ ছেড়ে চলে আস ার পর মিহির যে মাঝে মাঝে বাংলাদেশে গেছেন তার উল্লেখ বিষাদবৃক্ষে আছে। কিন্তু পিছারার খালের ধারে নিজেদের

ভিটেতে গিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন কি না তা আমরা জানতে পারিনা। হয়তো ইচ্ছা করেই বিষয়টি তিনি এড়িয়ে গেছেন, হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে চাননি। সাতপুষের ভিটেকে পরহস্তগত দেখার কষ্টকর অভিজ্ঞতা জানাতে চাননি, কিংবা হয়তো যাননি সেখানে ইচ্ছে করেই। গোটা পৃথিবী জুড়েই বাস্তুহারার বেদনা একই প্রকার। মনে পড়ছে ইহুদী অধিকৃত পশ্চিম জেজালেম সম্পর্কে এডওয়ার্ড সাইদের ব্যক্তিগত অনুভূতি, 'It is still hard for me to accept the fact that the very quarters of the city in which I was born, lived, and felt at home were taken over by Polish, German, and American immigrants who conquered the city and have made it the unique symbol of their sovereignty, with no place for Palestinian life.

দাদীআম্মার নাতি নাতনি দুলাল আর শিরির সঙ্গে পরবর্তীকালে বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ থাকলেও মিহির লক্ষ করতে ভোলেননি বৃদ্ধার অসাম্প্রদায়িক উদারতা উত্তরপুরষে এসে মৌলবাদের কানাগলিতে দিগভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। যে শূন্যতাকে পেছনে রেখে ষাটের দশকের গোড়ায় মিহির ভারতে পাড়ি দিয়েছিলেন সেই শূন্যতা যে বাংলাদেশ অতিক্রম করতে পেরেছে এমন কোনো প্রমাণ তিনি অন্তত পাননি। বারম্বার তাঁর প্রত্যয়ী উচ্চারণই আমরা শুনি 'পিছারার খালের আবেষ্টনীতে আজও যদি কেউ হঠাৎ গিয়ে পড়ে, সেই শূন্যতা আজ পঞ্চাশ বছর পরেও কবরের নিস্তব্ধতার মতোই হাহাকার পূর্ণ, তা কি ছিন্নতা ও শূন্যতার হাহাকার অবশ্য ভারতে ও আমরা দেশের নানা কোণে , নানা স্তরে দেখতে পাই। দেশ ভেদে সম্প্রদায়ভেদে অরণ্যে পাহাড়ে, সমতলে তার প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন চেহারা পায় কিন্তু মৌল একই থাকে।

।। পাঁচ ।।

'এই বিষণ্ন ব্রতকথা যদিও ব্যক্তিক উত্থানপতনের কথায় অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু এই বিষাদবৃক্ষ এবং বিষাদিনী নদীর সন্তানেরা সবাই তার অংশী । আমি শুধু কথকমাত্র।'

এই ব্রতকথা পড়তে গিয়ে অভিভূত, আবিষ্ট পাঠকের মনেও একটি প্রশ্ন জাগে, কথাসাহিত্যের কোন শ্রেণীতে একে ফেলা যায়। কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন একটি রচনাকে কোনো ছকে ফেলা কি একান্ত জরি? একটা লেবেল কি না লাগালেই নয়? সাহিত্য জিজ্ঞাসু মাত্রেই জানেন ফর্মের প্রশ্ন একটা নিশ্চিত উত্তর পাওয়া কতো দরকারি। কোনো শিল্পরূপে দুটি পৃথক ধারার সম্মেলন থাকলে সেটিও বুঝে নেওয়া দরকার। সংস্কৃতে যেমন ছিল গদ্যে পদ্যে মিলানো চম্পুকাব্য। বিষাদ বৃক্ষ প্রসঙ্গে কথাটা উঠল কারণ এখানে দ্বিধাস্মৃতিকথা ও উপন্যাস দুটি অভিধা নিয়ে । ব্লার্বে বলা হয়েছে এটি 'একখানি শক্তিশালী এবং বিষাদময় আত্মস্মৃতি।' কিন্তু গ্রন্থটি আনুপূর্বিক পাঠের পর রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের অভিমত শিরোধার্য মনে হয়, 'ইহাকে একখানি উপন্যাস বলিয়াই মনে করি।' উপন্যাসের জগত বিশাল এবং এবং বিচিত্র, তাতে ইতিহাস, ভূগোল, সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি, দর্শন ধর্ম সব কিছুরই ঠাঁই আছে, যেমনটি ছিল পুরনো কালের মহাকাব্যে। মহাকাব্য আর উপন্যাস একই গোত্রসম্ভূত। রবীন্দ্রকুমার বিষাদবৃক্ষকে 'গদ্য মহাকাব্য' বলেছেন। মহাকাব্যের প্রসারতাও সমুন্নতি বিষাদবৃক্ষে আছে সেই সঙ্গে রয়েছে আধুনিক উপন্যাসের জটিল চরিত্রলক্ষণ। গোড়া থেকেই উপন্যাস একটি অনন্ত সম্ভাবনাময় কথা শিল্প, তাই এই শিল্পরূপ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষারও অন্ত নেই। আত্মজৈবনিক উপাদান তো উপন্যাসের ক্ষেত্রে স্বীকৃত অবলম্বনবহুযুগ আগে থেকেই। কখনো যদি সেই আত্মকথা সরাসরি লেখক উত্তমপুষের জবানীতে - বিবৃত করেন তাতে উপন্যাসত্বের হানি হয়না। ডেভিড কপারফিল্ড, ইন্দিরা, শ্রীকান্ত, টিনড্রাম বা আরণ্যক সবই তো এই 'আমি'র গল্প। বিষাদবৃক্ষের কেন্দ্রীয় চরিত্রের নামমিহির সেনগুপ্ত। প্রতিকূল রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতিতে, অবসন্ন পারিবারিক প্রতিবেশে একটি ব্যক্তির আত্মনির্মাণ ও আত্মবিকাশ এই উপন্যাসেমুখ্যবিষয়, সমান গুত্ব পেয়েছে যত্নে চিত্রিত সমাজপট। ক্যানভাসে পিছারার খাল, কীর্তিপাশা, বরিশাল শহর থাকলেও আসলে গোটাবাংলাদেশই তাতে প্রতিবিম্বিত হয়, যেমন মিহির সেনগুপ্তর জীবনদর্পণে প্রতিফলিত হয় লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু মানুষের জীবন কাহিনী, 'আমি' হয়ে ওঠে 'আমরা'। ব্যক্তিগত জীবনস্রোত যুগছবির মোহনায় মিলে যায়। পারিবারিক খুঁটিনাটি থাকলেও কখনোই এটি স্মৃতিকথার একতলায় আবদ্ধ থাকেনা, তথ্য ঋদ্ধ বিশ্লেষণে ঐতিহাসিক বা সামাজিক প্রবন্ধের প্রতিস্পর্ধী হলেও একে প্রবন্ধ বলা যাবে না। সংকটদীর্ণ সময়ের পটে একটি মানুষের ক্রমজায়মান জীবনদর্শন, বিচিত্র ঘটনাপুঞ্জকে মূল ভাবনার সূত্রে বেঁধে, ছোটো নানা উপাখ্যানের সমাহারে এবং ক্রমশ ঐসব গল্পমালাকে ছাড়িয়ে ছাপিয়ে ঐক্যময় মহৎ আখ্যান গড়ে তোলার যে শৈলী বিষাদ বৃক্ষে রয়েছে তা একটি ধ্রুপদী উপন্যাসেই থাকে। মিহির সেনগুপ্তের গদ্যরীতির মৌলিকতা লক্ষ করবার মতো। কখনো মুজতবা আলির কথা মনে পড়

ালেও, তাকে সম্পূর্ণ ঐ ঘরানায় বাঁধা যাবে না।প্রকৃত পক্ষে তাঁর গদ্য আমাদের মগ্নচৈতন্যের আলো আধাঁরকে অবয়ব দিতে পারে। প্রবন্ধের পরিসর চিন্তা করে উদ্ধৃতি থেকে বিরত থাকা গেল। চান্দ্রদ্বীপী কথোপকথনের ব্যবহারে বিষাদবৃক্ষের ভাষা আশর্চ্য জ্যান্ত একথা সকলেই স্বীকার করবেন কিন্তু এখানে একটি অভিযোগ না তুলে পারা যাচ্ছেনা, দরকার মতো পাদটীকা সংযোজন করলে কী ক্ষতি হতো? জন্মসূত্রে বাঙালরাও তো আজ ঐ ভাষার সঙ্গে সহজ পরিচয় হারিয়ে ফেলছে। একটু বাতি ধরলে রসাস্বাদন আরো সুগম হতে পারতো। বর্ধমান জেলার সন্তান এক বন্ধুর আন্তরিক আক্ষেপ মনে পড়ে যাচ্ছে। তাঁর পক্ষে সমস্তশব্দে প্রবেশাধিকার নেহাতই দুঃসাধ্য। সতীনাথভাদুড়ি 'ঢোঁড়াই চরিতমানসে' একটু হ াত বাড়িয়ে দিয়েছেন, পরবর্তী সংস্করণে মিহির সেনগুপ্তের কাছেও আমরা সেই প্রত্যাশা করতেপারি কি? ব্রতকথা বা পাঁচ ালিতে পুনত্তি থাকে, বিষাদবৃক্ষও সেই ধারা যেন কিছুটা রাখতে চেয়েছে। কিন্তু এ সব ছোটোখাটো ত্রুটির কথা থাক, রচনাটি অসামান্য বলেই এসব সামান্য ব্যাপার চোখে পড়ছে, 'শুক্ল বস্ত্রে যৈছে মসীবিন্দু।' দেশভাগ নিয়ে যেসব লেখালেখি এই অকিঞ্চিৎকর জীবনে পড়ে উঠতে পেরেছি তার মধ্যে একমাত্র সাদাত হাসান মান্টোর গল্পগুলির সঙ্গেই মুত্ত ও পূর্ণ ম ানবধর্মিতায় বিষাদবৃক্ষ তুলনীয় হতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জি ঃ-
১। সংখ্যালঘু বিতাড়ন বাংলাদেশ -- একটি সমীক্ষা, রত্নের ভট্টাচার্য, কালধবনি জানুয়ারি ২০০২
১। শঙ্খ ঘোষের শ্রেষ্ঠকবিতা
৩। ছড়াসমগ্র, অন্নদাশঙ্গর রায়
৪। দেশ বইসংখ্যা ২০০৫
৫। বইয়ের দেশ, জানুয়ারি ২০০৫
৬। নীলকন্ঠ পাখির খোঁজে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
৭। Out of Place, Edward W. Said
৮। The Marginal Men, Prafulla K. Chakrabarti
৯। In an antique land, Amitav Ghosh
১০। পরবাসী কুড়ানী ও দামাসান, মণীন্দ্র গুপ্ত
১১। অবভাস চতুর্থ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা।
১২। পরিকথা বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধের শতবর্ষ সংখ্যা।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com